بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ জুন, ২০২১ মোতাবেক ১৮ এহসান, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজকাল হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ হচ্ছে। হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডেকে বলেন, আমাকে উমর সম্পর্কে (কিছু) বল? তখন তিনি অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূলের খলীফা! আল্লাহ্‌র কসম! তাঁর স্বভাবে যে কিছুটা কঠোরতা রয়েছে তা বাদ দিলে হযরত উমর (সম্পর্কে) আপনার যে মতামত রয়েছে (তিনি) তার চেয়েও উত্তম। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, (তাঁর স্বভাবে) কঠোরতা থাকার কারণ হল, তিনি আমার মাঝে নম্রতা দেখেন। এমারতের দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে অর্পিত হলে এমন অনেক বিষয় যা তাঁর মাঝে রয়েছে, তিনি তা পরিত্যাগ করবেন, কেননা আমি তাঁকে দেখেছি, আমি কারো প্রতি কঠোর হলে তিনি আমাকে সেই ব্যক্তির প্রতি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেন আর আমি যখন কারো প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করি বা কোমল ব্যবহার করি তখন তিনি আমাকে তার প্রতি কঠোর হওয়ার কথা বলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-কে ডাকেন এবং তাঁর কাছে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসমান (রা.) বলেন, তাঁর ভেতর তাঁর বাহির থেকেও উত্তম আর আমাদের মাঝে তাঁর মতো কেউ নেই। তখন হযরত আবু বকর (রা.) উভয় সাথীকে বলেন, আমি তোমাদের উভয়কে যা বলেছি এর উল্লেখ অন্য কারো কাছে করবে না। আমি যদি উমরকে বাদ দেই তাহলে উসমানের চেয়ে আগে যাবো না অর্থাৎ, (তাঁরা) উভয়ে তাঁর দৃষ্টিতে এমন মানুষ ছিলেন যারা খিলাফতের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনকারী ছিলেন, আর তাঁদের এই অধিকার থাকবে যে, তাঁরা তোমাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের দায়িত্ব পালনের) বিষয়ে কোন ঘাটতি না রাখার মর্যাদায় থাকবে। এখন আমার আকাঙ্ক্ষা হল, তোমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়া আর তোমাদের অতীত লোকদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাওয়া। হযরত আবু বকর (রা.)'র (অন্তিম) অসুস্থতার দিনগুলোতে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন, আপনি হযরত উমর (রা.)-কে মানুষের খলীফা নিযুক্ত করেছেন, অথচ আপনি দেখছেন, তিনি আপনার উপস্থিতিতেই মানুষের সাথে কীরূপ ব্যবহার করেন, আর তখন কী অবস্থা হবে যখন তিনিই সর্বেসর্বা হবেন বা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হবেন? আর আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং (তিনি) আপনার কাছে প্রজাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমাকে বসাও। তখন তাঁকে ধরে বসালে, তিনি (রা.) বলেন, তুমি কি আমাকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাচ্ছ? আমার প্রভুর সাক্ষাতে তিনি আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তরে বলব, আমি তোমার বান্দাদের মধ্য হতে সর্বোত্তম (ব্যক্তিকে) তোমার বান্দাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে ওসীয়্যত লিখিয়ে দেয়ার জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে একান্তে ডাকেন। এরপর বলেন, লেখ, **বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম**। এটি মুসলমানদের নামে আবু বকর বিন আবু কাহাফার ওসীয়্যত। এটুকু বলার পর তিনি (রা.) অচেতন হয়ে পড়েন এবং হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে লিখেন, আমি তোমাদের জন্য উমর

বিন খাত্তাবকে খলীফা নিযুক্ত করেছি আর আমি তোমাদের বিষয়ে কল্যাণ কামনায় কোনরূপ কার্পণ্য করি নি। হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা ফিরে পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করেন, কি লিখেছ আমাকে পড়ে শোনাও? হযরত উসমান (রা.) পড়ে শোনালে আবু বকর (রা.) বলেন, **'আল্লাহু আকবর'** আমার মনে হয় তুমি শংকিত ছিলে যে, আমি যদি এই অচেতন অবস্থায় মারা যাই তাহলে মানুষের মাঝে আবার মতভেদ না দেখা দেয়! হযরত উসমান (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তোমাকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করুন। অর্থাৎ, হযরত উসমান (রা.) নিজের পক্ষ থেকে হযরত উমর (রা.)'র খলীফা হওয়া সংক্রান্ত এই যে বাক্য লিখেছিলেন– এ সম্পর্কে আবু বকর (রা.) কোন আপত্তি করেন নি। তাবারির ইতিহাসে লিখিত আছে, মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম বিন হারেস বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে নির্জনে ডাকেন এবং বলেন, লেখ **'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম'**। এই অঙ্গীকারনামা আবু বকর বিন আবু কাহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান হারান এবং তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। যেমনটি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এরপর, হযরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান ফিরে পান আর পূর্বে বর্ণিত কথাগুলো হয়। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে পড়ে শোনানোর জন্য বলেন, তা শুনে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) **'আল্লাহু আকবর'** বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি যে এই বাক্যটি লিখেছ আল্লাহ্ তোমাকে ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে এজন্য উত্তম প্রতিদান দিন। হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত লেখা সেভাবেই রাখেন, কোন পরিবর্তন করেন নি। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে বলেন খলীফা হিসেবে কারো নাম আমার কাছে প্রস্তাব কর। খোদার কসম! আমার দৃষ্টিতে তুমি পরামর্শ দেয়ার যোগ্য। তিনি হযরত উমর (রা.) (এর নাম) বলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, লেখ। তখন তিনি লেখা আরম্ভ করেন, নাম পর্যন্ত পৌঁছলে হযরত আবু বকর (রা.) অজ্ঞান হয়ে যান। এরপর যখন হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা ফিরে পান তখন তিনি বলেন, লেখ উমর। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র ওসীয়্যত লিপিবদ্ধ করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) অচেতন হয়ে পড়েন। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.)'র নাম লিখে দেন। হযরত আবু বকর (রা.) যখন চেতনা ফিরে পান তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী লিখেছ? তিনি বলেন, আমি লিখেছি, উমর। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম তুমি তা-ই লিখেছ। তুমি যদি নিজের নামও লিখে দিতে, তাহলে তুমিও এর যোগ্য ছিলে।

একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) যখন অসুস্থ হন তখন তিনি হযরত আলী (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) আর মুহাজির ও আনসারদের কতিপয় ব্যক্তির কাছে বার্তা প্রেরণ করেন এবং বলেন, এখন সময় এসে গেছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ; অথচ তোমাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কেউ দণ্ডায়মান হয় নি। তোমরা যদি চাও তাহলে নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে নির্বাচিত করে নাও। অথবা তোমরা চাইলে আমি তোমাদের জন্য মনোনীত করতে পারি। তারা নিবেদন করেন, বরং আপনি আমাদের জন্য মনোনীত করুন। তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে বলেন, লেখ, এটি সেই অন্তিম ওসীয়্যত যা আবু বকর বিন আবু কাহাফা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় করেছেন আর প্রথম প্রত্যয়ন যা পরজগতে প্রবেশের সময় করেছে, যেখানে পাপাচারী তওবা করবে, কাফির ঈমান আনবে এবং মিথ্যাবাদী সত্যায়ন করবে। সেই অঙ্গীকার হল, তিনি

সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর আমি খলীফা নিযুক্ত করছি, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) চেতনা হারান, তখন হযরত উসমান (রা.) নিজে থেকেই উমর বিন খাত্তাব (রা.) (এর নাম) লিখে দেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আবু বকর (রা.) বলেন, তুমি কিছু লিখেছ কি? তখন তিনি বলেন, জ্বী হ্যাঁ, আমি লিখেছি উমর বিন খাত্তাব। তখন হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি কৃপা করুন। তুমি যদি নিজের নামও লিখে দিতে তাহলে তুমিও তার যোগ্য ছিলে। অতএব তুমি লেখ, আমি আমার পর উমর বিন খাত্তাবকে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করছি। আর আমি তোমাদের জন্য তাঁকে মনোনীত করে সন্তুষ্ট। ওসীয়্যতনামা লেখা সমাপ্ত হলে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এটি মানুষকে পড়ে শোনানো হোক। এরপর হযরত উসমান (রা.) মানুষকে একত্রিত করেন আর তিনি তাঁর মুক্ত ক্রীতদাসের হাতে উক্ত পত্র প্রেরণ করেন। তখন হযরত উমর (রা.)ও তাঁর সাথে ছিলেন। হযরত উমর (রা.) মানুষকে বলতেন, চুপ হয়ে যাও আর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফার কথা শোন, কেননা তিনি তোমাদের কল্যাণ কামনায় ত্রুটি করেন নি। তখন মানুষ শান্তভাবে বসে পড়ে আর তাদের সামনে ওসীয়্যতনামা পাঠ করা হয়। তারা তা শুনে এবং আনুগত্য করে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের প্রতি মনোযোগী হন এবং বলেন, তোমরা কি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট যাঁকে আমি তোমাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি? কেননা আমি কোন আত্মীয়কে তোমাদের খলীফা নিযুক্ত করি নি। আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য উমর (রা.)-কে খলীফা নিযুক্ত করেছি। অতএব, তোমরা তাঁর কথা শুনবে এবং আনুগত্য করবে। আল্লাহ্‌র কসম! নিশ্চয় আমি এই বিষয়ে কম চিন্তাভাবনা করি নি। উত্তরে মানুষ বলে, আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে ডাকেন এবং বলেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি। তারপর তিনি হযরত উমর (রা.)-কে আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন করার ওসীয়্যত করেন বা উপদেশ দেন। অতঃপর তিনি বলেন, হে উমর! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র কিছু প্রাপ্য রয়েছে যা রাতের অন্ধকারে প্রদান করতে হয়, যা তিনি দিনের বেলা গ্রহণ করেন না। অপরদিকে কিছু অধিকার রয়েছে দিনের, যা তিনি রাতে কবুল করেন না। আর নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) ততক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদত কবুল করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত আবশ্যিক ইবাদত পূর্ণ না হয়। হে উমর! তুমি কি দেখ না যে, তাদেরই পাল্লা ভারী যাদের সত্যের অনুসরণ এবং পাল্লা ভারী হওয়ার কল্যাণে কিয়ামতের দিনও তাদের পাল্লা ভারী হবে। অর্থাৎ যারা সত্যের অনুসরণ করবে কিয়ামতের দিন তাদেরই পাল্লা ভারী হবে। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, আর দাড়িপাল্লার ক্ষেত্রে সত্য কথা হল, আগামীকাল এতে সেই জিনিসই রাখা হবে যা ভারী হবে। হে উমর! তুমি কি দেখ না, তাদেরই পাল্লা হালকা যাদের পাল্লা কিয়ামত দিবসে হালকা হবে– তাদের মিথ্যার অনুসরণ আর তাদের হালকা হওয়ার কারণে। অর্থাৎ তারা সত্যের অনুসরণ করছিল না আর পুণ্যকর্মও করছিল না। এর ফলে কিয়ামতের দিনও তাদের পাল্লা হালকা হবে। আর পাল্লার জন্য সত্য কথা হল, যখনই এতে মিথ্যাকে রাখা হবে তা ওজনে হালকাই হবে। হে উমর! তুমি কি দেখ না, কোমলতা সংক্রান্ত আয়াত কঠোরতার আয়াতের সাথে অবতীর্ণ হয়েছে আর কঠোরতার আয়াত কোমলতা সংক্রান্ত আয়াতের সাথে, যাতে মু'মিনের মাঝে অনুরাগের পাশাপাশি ভয়ও থাকে। একদিকে তার মাঝে পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ থাকবে আর অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লার ভয়ও থাকবে। সে যেন এমন কোন বাসনা লালন না করে যার সাথে আল্লাহ্‌র কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং নিজের কৃত কোন বিষয়ে সে যেন ভীত না হয়। হে উমর! তুমি কি দেখ না, জাহান্নামীদেরকে

আল্লাহ্ তা'লা শুধুমাত্র তাদের অপকর্মের কারণে স্মরণ করেছেন। অতএব, যখনই তুমি তাদের কথা উল্লেখ করবে তখন বল, নিশ্চয় আমি আশা করি, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। আল্লাহ্ তা'লা জান্নাতীদের কথা শুধুমাত্র তাদের সৎকর্মের কারণে বলেছেন, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব, তুমি যখন তাদের কথা উল্লেখ করবে, তখন বল, আমার কর্ম কি তাদের কর্মের মতো? অর্থাৎ নিজের হৃদয়কে প্রশ্ন কর।

হযরত আবু বকর (রা.)'র মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, আমার কাছে মুসলমানদের যে সম্পদ রয়েছে তা ফিরিয়ে দাও। আমি সেই সম্পদ থেকে কিছুই নিতে চাই না। আমার জমি, যা অমুক অমুক জায়গায় রয়েছে তা মুসলমানদের জন্য আর তা সেসব সম্পদের বিনিময়ে যা আমি খরচ হিসেবে বায়তুল মাল থেকে নিয়েছিলাম। এসব জমি, উষ্ট্রী, তরবারিতে শানদানকারী, ক্রীতদাস এবং চাদর, যার মূল্য ছিল পাঁচ দিরহাম, হযরত উমর (রা.)-কে দিয়ে দেয়া হয়। হযরত উমর (রা.) এসব জিনিস দেখে বলেন, ইনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পরবর্তীজনকে কঠিন পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিয়েছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.)-কে কেউ জিজ্ঞেস করেন, মুসলমান হওয়ার পর আপনার প্রকৃতিতে সেই কঠোরতা অবশিষ্ট নেই যা অজ্ঞতার যুগে ছিল। তখন হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, কঠোরতা তো এখনও আগের মতোই আছে, কিন্তু এখন তা কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রদর্শিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

হযরত আবু বকর (রা.)-কে মানুষ বলেছিল, আপনি আপনার পরে হযরত উমর (রা.)-কে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কেননা তিনি অনেক রাগী মানুষ। তিনি (রা.) বলেন, তাঁর ক্রোধ ততক্ষণই প্রকাশ পায় যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোমল। আর আমি যখন থাকব না তখন তিনি নিজেই কোমল হয়ে যাবেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন,

"হযরত উমর (রা.)'র রাগের বিষয়ে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো আপনি খুব রাগী স্বভাবের ছিলেন। হযরত উমর (রা.) উত্তরে বলেন, রাগ এখনও তা-ই আছে। কিন্তু পূর্বে তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে প্রকাশ পেত কিন্তু এখন তা সঠিক জায়গায় প্রকাশ পায়, যথাস্থানে রাগ প্রদর্শিত হয়'।" জামে' বিন শিদ্দাদ তার কোন নিকটাত্মীয়ের বরাতে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, **"হে খোদা! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও, আমি কঠোর স্বভাবের, আমাকে কোমলচিত্ত বানিয়ে দাও, আমি কৃপণ, আমাকে উদার বানিয়ে দাও।"**

হযরত উমর (রা.) খলীফা মনোনীত হবার পর প্রথম যে বক্তৃতা করেছিলেন সে বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। একটি রেওয়ায়েত হল, হুমায়েদ বিন হেলাল বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)'র মৃত্যুর সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, "হযরত উমর (রা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)'র দাফনকার্য সমাপ্ত করার পর নিজ হাত থেকে কবরের মাটি ঝেড়ে ফেলেন এরপর নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে বলেন, **'নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে এবং আমাকে তোমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। আর তিনি আমার উভয় সাথীর প্রস্থানের পর আমাকে তোমাদের মাঝে জীবিত রেখেছেন। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের যে বিষয়ই আমার সম্মুখে উপস্থাপিত হবে, আমি ছাড়া কেউ তা দেখাশোনা করবে না আর যে**

বিষয় আমার নাগালের বাইরে থাকবে তার দেখাশোনার জন্য আমি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত লোকদেরকে নিযুক্ত করব অর্থাৎ এমন লোকদেরকে নিযুক্ত করা হবে যারা তোমাদের তত্ত্বাবধান করবে এবং উক্ত বিষয়সমূহ দেখবে। মানুষ যদি ভালো ব্যবহার করে, আমিও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব আর যদি তারা অন্যায় করে, তাহলে আমি তাদেরকে শাস্তি দিব'।" হাসান বলেন, "আমাদের ধারণা হল, হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম যে খুতবা দিয়েছেন তা হল, তিনি প্রথমে খোদার গুণকীর্তন করেন, এরপর বলেন: **'আমাকে তোমাদের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে আর তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। আর আমার উভয় সাথীর বিদায়ের পর আমাকে তোমাদের মাঝে জীবিত রাখা হয়েছে। অতএব, যে বিষয়ই আমাদের সামনে আসবে, আমরা সেটি দেখাশোনা করব আর যে বিষয় আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে সে বিষয়ের জন্য শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করব আর যে ভালো কাজ করবে আমরা তাকে পুরস্কৃত করব আর যে অপকর্ম করবে আমরা তাকে শাস্তি দিব। আল্লাহ্ আমাদেরকেও ক্ষমা করুন এবং তোমদেরকেও (ক্ষমা করুন)'।"**

জামে' বিন শিদ্দাদ তার পিতার বরাতে বলেন, "হযরত উমর (রা.) যখন মিম্বরে দণ্ডায়মান হন তখন তাঁর প্রথম বাক্য ছিল, **'আল্লাহুম্মা ইন্নি শাদিদুন ফালাইয়্যেনি ওয়া ইন্নি যাঈফুন ফাকাওয়িনি ওয়া ইন্নি বাখিলুন ফাসাখ্খিনি।' তথা হে আল্লাহ্! আমি কঠোর স্বভাবের মানুষ, আমাকে কোমলচিত্ত বানিয়ে দাও, আমি দুর্বল, তুমি আমাকে শক্তিশালী বানিয়ে দাও আর আমি কৃপণ, তুমি আমাকে উদার বানিয়ে দাও।"** জামে' বিন শিদ্দাদ তার পিতার বরাতে বলেন, "হযরত উমর (রা.) যখন খলীফা মনোনীত হন, তিনি মিম্বরে আরোহণ করে বলেন, 'আমি কয়েকটি কথা বলতে চাই। সেগুলো শুনে তোমরা আমীন বলবে।' এটিই ছিল তাঁর প্রথম কথা যা খলীফা মনোনীত হবার পর তিনি বলেছিলেন।"

হুসাঈন মুরী বর্ণনা করেন, "হযরত উমর (রা.) বলেন, 'আরবদের দৃষ্টান্ত নাকে রশি পরানো উটের ন্যায় যে নিজ নেতার পেছনে চলে বা অনুসরণ করে। অতএব, নেতার দেখা উচিত যে, সে উটকে কোন দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার যতটুকু সম্পর্ক আছে, কা'বার প্রভুর শপথ! আমি তাদেরকে সুনিশ্চিতভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করব'।" প্রথম বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তোমরা আমীন বলবে' কিন্তু এর বিস্তারিত বিবরণ নেই। বা নাকে 'রশি পরানো উটের উপমা বিষয়ক যে রেওয়ায়েত' শোনালাম সেটিই বিস্তারিত বিবরণ। যাহোক, হযরত উমর (রা.) খলীফা মনোনীত হবার পর তৃতীয় দিন এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি হল, হযরত উমর (রা.) যখন জানতে পারেন যে, মানুষ তাঁর ভয়ে ভীত। তখন তাঁর নির্দেশে মানুষজনের মাঝে উচ্চস্বরে **'আসসালাতুল জামেয়া'** অর্থাৎ 'নামায শুরু হতে যাচ্ছে ধ্বনি দেয়া হয়, ফলে লোকজন সব উপস্থিত হয়। তিনি তখন মিম্বরের সেই স্থানে গিয়ে বসেন যেখানে হযরত আবু বকর (রা.) পা রাখতেন। যখন সবাই সমবেত হয়, তখন তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং যথাযথ বাক্যাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, মানুষজন আমার রাগী স্বভাবের কারণে ভয় পাচ্ছে এবং তারা আমার ক্রুদ্ধপ্রকৃতি নিয়ে ত্রস্ত। আর তারা বলছে, 'উমর তখনও আমাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করতো যখন মহানবী (সা.) আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন; আর তখনও আমাদের প্রতি কঠোরতা করতো যখন তিনি নন, বরং আবু বকর (রা.) আমাদের শাসক ছিলেন। এখন যখন পুরো কর্তৃত্বই তার হাতে; এখন না জানি কী অবস্থা হয়?!' যে এমনটা বলেছে, সে ঠিকই বলেছে। নিঃসন্দেহে

আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলাম এবং তাঁর দাস ও সেবক ছিলাম। তিনি (সা.) এমন মানুষ ছিলেন যে, কেউই নম্রতা ও দয়ার্দ্রচিত্ততার ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) এ অভিধায় ভূষিত করেছেন এবং তাঁকে নিজের নামসমূহের মধ্য থেকে রঊফ ও রহীম– এ দু'টো নামে অভিহিত করেছেন। আর আমি একটি নগ্ন তরবারি ছিলাম যেন মহানবী (সা.) চাইলে আমাকে খাপে ভরে নিতে পারতেন, অথবা আমাকে ছেড়ে দিলে আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলার বৈশিষ্ট্য রাখতাম। এভাবেই চলছিল, আর আমার প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন; আর আমি আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমি এ দৃষ্টিকোন থেকে সৌভাগ্যবান ছিলাম। এরপর আবু বকর (রা.) জনগণের শাসক হন, আর তিনি এমন মানুষ ছিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউই তাঁর চিত্তের নম্রতা, দয়া ও কোমলপ্রকৃতির কথা অস্বীকার করবে না। আর আমি তাঁর সেবক ও তাঁর সহকারী ছিলাম; আমি তাঁর নম্রতার সাথে নিজের কঠোরতাকে সম্পৃক্ত করে নগ্ন তরবারি হয়ে যেতাম ও তাঁর হাতে থাকতাম। তিনি চাইলে আমাকে খাপে ভরে নিতে পারতেন, অথবা চাইলে আমাকে ছেড়ে দিতে পারতেন যেন আমি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলি। আর আমি এভাবেই তাঁকে সঙ্গ দেই, এক পর্যায়ে মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এমন অবস্থায় মৃত্যু দেন যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যে, আমি এ দৃষ্টিকোন থেকে সৌভাগ্যবান ছিলাম। হে লোকসকল! এরপর আমি তোমাদের কর্মকর্তা নিযুক্ত হয়েছি; তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার যে, সেই রাগ এখন প্রশমিত করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নীপিড়নকারীদের প্রতি প্রদর্শিত হবে। [তোমাদের প্রতি কোমল কিন্তু শত্রুদের প্রতি কঠোরতা প্রকাশ পাবে।] বাকি রইল যারা পুণ্য-স্বভাববিশিষ্ট, ধার্মিক ও সৎকর্মশীল; তারা একে অপরের প্রতি যতটা নম্রতা প্রদর্শন করে, আমি তার চেয়েও বেশি তাদের প্রতি নম্র থাকব। আর যাকেই আমি অন্যের প্রতি অত্যাচারী ও হস্তক্ষেপকারী পাব, তার এক গালে পা রেখে অন্য গাল আমি মাটিতে চেপে ধরব, যতক্ষণ না সে সত্য ও ন্যায় ভালোভাবে বুঝতে পারে; [অর্থাৎ খুবই কঠোর আচরণ করব।] হে জনগণ! আমার কাছে তোমাদের অনেকগুলো প্রাপ্য অধিকার রয়েছে, যেগুলো আমি উল্লেখ করে দিচ্ছি; তোমরা সেগুলোর জন্য আমাকে পাকড়াও করতে পার। আমার প্রতি তোমাদের এই প্রাপ্য অধিকার রয়েছে যে, তোমাদের কল্যাণে ব্যয় করার জন্য যেই সম্পদ রয়েছে, কিংবা আল্লাহ্ তা'লা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে যা তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন– তাথেকে কিছু যেন আমি লুকিয়ে না রাখি; কেবলমাত্র তা ব্যতীত যা আল্লাহ্ তা'লার কাজের জন্য রেখে দিই। আমার কাছে তোমাদের অধিকার হল, সেই সম্পদ যেন যথার্থ ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়। আর আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্য হল, আমি যেন তোমাদের বেতন-ভাতা প্রভৃতি তোমাদেরকে প্রদান করি। আমার ওপর তোমাদের অধিকার হল, আমি যেন তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দেই; আর যখন তোমরা মুসলিম-বাহিনীর অংশ হয়ে বাড়ির বাইরে থাক, তখন যেন আমি তোমাদের সন্তানদের পিতার দায়িত্ব আমি পালন করি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তাদের কাছে ফিরে আস। আমি তোমাদেরকে আমার এই কথাগুলো বলছি আর একইসাথে আমি আল্লাহ্‌র কাছে নিজের ও তোমাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

মুসলমানদের দৃষ্টিপটে সর্বদা এই আয়াত تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا থাকতো– অর্থাৎ যারা শাসন করার জন্য উপযুক্ত, যারা নিজেদের মাঝে সাংগঠনিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্যতা রাখে– তাদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ কর। এরপর যখন দায়িত্বভাররূপী এই আমানত কিছু লোকের ওপর ন্যস্ত হত, তখন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্বভার পালন করার বিষয়টি সর্বদা তাদের দৃষ্টিপটে থাকত। যদি তোমরা ন্যায়পরায়ণতাকে অবজ্ঞা কর, যদি তোমরা সততাকে দৃষ্টিগোচর না রাখ আর বিশ্বাসঘাতকতা কর, তবে খোদা তোমাদের কাছ থেকে হিসাব নিবেন এবং তোমাদেরকে এই অপরাধের শাস্তি দিবেন। এটিই সেই বিষয় ছিল যার প্রভাব হযরত উমর (রা.)'র চরিত্র ও প্রকৃতিতে এত গভীর ও সুস্পষ্ট ছিল যে, তা দেখে মানুষের শরীর শিউরে ওঠে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) ইসলাম ও মুসলমানদের উন্নতির জন্য এতটাই ত্যাগ স্বীকার করেছেন যে, ইউরোপিয়ান লেখকরা, যারা দিনরাত মহানবী (সা.)-এর প্রতি আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে এবং নিজেদের বইপুস্তকে মহানবী (সা.) নাউযুবিল্লাহ্ সততার সাথে কাজ করেন নি মর্মে নিতান্তই দাপট দেখিয়ে লিখে, তারাও হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)'র কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একথা স্বীকার না করে পারে না যে, তারা যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে কাজ করেছেন এর দৃষ্টান্ত অন্য কোন শাসকের মাঝে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে তারা হযরত উমর (রা.)'র কাজের সীমাহীন প্রশংসা করে; তারা বলে, ইনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যিনি দিনরাত পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইসলামী আইনের প্রসার এবং মুসলামানদের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন। কিন্তু এতকিছুর পরও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত সচেতনতার চিত্র দেখুন– অগণিত সেবা, সহস্র কুরবানি ও অগণিত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার পরও তাঁর দৃষ্টিপটে এই আয়াতগুলিই ছিল যে, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (সূরা আন্ নিসা: ৫৯) এবং সাথে إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا অর্থাৎ যখন খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তোমাকে কোন দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তোমার দেশের মানুষ ও নিজ ভাইয়েরা শাসক হিসেবে তোমাকে নির্বাচিত করে, তখন তোমার আবশ্যিক দায়িত্ব হল, ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করা এবং তোমার সর্বশক্তি মানবজাতির কল্যাণার্থে ব্যয় করা। দেখুন! হযরত উমর (রা.)'র জীবনে এই ঘটনা কতইনা মর্মন্তুদ। তাঁর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে, যখন তাঁকে (রা.) অত্যাচারী মনে করে এক ব্যক্তি অজ্ঞতার দরুন ছুরি দিয়ে আক্রমণ করে বসে এবং নিজ মৃত্যুর বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, তখন তিনি (রা.) বিছানায় নিতান্তই ব্যাকুলতার সাথে ছটফট করছিলেন এবং বার বার দোয়া করছিলেন, **'আল্লাহুম্মা লা আলাইয়্যা ওয়ালা লী'**। অর্থাৎ হে খোদা! তুমি আমাকে শাসক নিযুক্ত করেছ এবং একটি আমানত তুমি আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করেছ। আমি জানি না এই শাসনকার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করেছি কি না। এখন আমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট আর আমি ধরাধাম ত্যাগ করে তোমার নিকট ফিরে আসছি। হে আমার প্রভু! আমি নিজ কর্মের বিনিময়ে তোমার নিকট কোন প্রতিদান চাই না, কোন পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষি আমি নই; বরং হে আমার প্রভু! আমি শুধু এ ভিক্ষা চাই যে, তুমি কৃপা করে আমাকে ক্ষমা কর এবং এই দায়িত্ব পালনে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে তা মার্জনা করো। হযরত উমর (রা.) সেই সুমহান মানুষ ছিলেন যার ন্যায়বিচার ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত ভূপৃষ্ঠে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (সূরা আন্ নিসা: ৫৯) এর অধীনে যখন তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন তখন এত ব্যাকুলতা ও এত উৎকণ্ঠার মাঝে ইহধাম ত্যাগ করেন যে, সেসব সেবাকর্ম যা দেশের কল্যাণার্থে করেছেন, সেসব সেবাকর্ম যা মানুষের কল্যাণার্থে করেছেন, সেই

সমস্ত কাজ যা ইসলামের উন্নতির জন্য করেছেন, তা তাঁর কাছে একান্ত তুচ্ছ মনে হয়। সেই সমস্ত সেবাসুলভ কাজ যা তাঁর (রা.) দেশের মুসলমানদের দৃষ্টিতে ছিল আকর্ষণীয় বরং সেসব সেবাকর্ম যা তাঁর দেশের বিজাতীয়দের নিকটও ভালো হিসেবে পরিগণিত ছিল, সেসব সেবা যেগুলো শুধুমাত্র তাঁর নিজ দেশের নাগরিকদের কাছে নয় বরং বহির্বিশ্বের লোকদের কাছেও ভালো মনে হতো, তার সেসব সেবাকর্ম ও অবদান কেবল তাঁর যুগের লোকদের মাঝেই সমাদৃত ছিল না বরং আজ তেরশ' বছর অতিবাহিত হবার পরও যারা হযরত উমর (রা.)'র মনিবের ওপর আক্রমণ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না তাদের সামনে যখন হযরত উমর (রা.)'র সেবাকর্ম ও অবদানের উল্লেখ হয় তখন তারা বলে, নিঃসন্দেহে উমর স্বীয় কাজ ও অবদানের ক্ষেত্রে অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সেসব কর্মকাণ্ড ও অবদান স্বয়ং হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টিতে খুবই নগণ্য ও তুচ্ছ হয়ে যায় আর তিনি অস্থির হয়ে দোয়া করেন, **'আল্লাহুম্মা লা আলাইয়্যা ওয়ালা লী'** অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমার ওপর একটি আমানত ন্যস্ত করা হয়েছিল আমি জানি না, আমি আদৌ এর প্রতি সুবিচার করতে পেরেছি কি না। তাই, তোমার কাছে কেবল এতটুকুই আমার আকুতি, তুমি আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা কর এবং আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) **'দুনিয়া কা মুহসিন'** শিরোনামে এক বক্তৃতায় বলেন,

হযরত উমর (রা.) সেই ব্যক্তিত্ব ছিলেন যার সম্পর্কে খ্রিস্টান ইতিহাসবিদও লিখেছে যে, তিনি যেভাবে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেছেন পৃথিবীর অন্য কেউ এমনটি করতে পারে নি। তারা মহানবী (সা.)-কে গালি দেয় ঠিকই কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র প্রশংসায় পঞ্চমুখ। মহানবী (সা.)-এর নিত্য সঙ্গী এই ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় এই আকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন যে, তাঁর ঠাঁই যেন মহানবী (সা.)-এর চরণে হয়। মহানবী (সা.)-এর কোন কাজ থেকে যদি কোথাও এ বিষয়টি প্রকাশ পেতো যে, তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছেন না তাহলে হযরত উমর (রা.)'র মত ব্যক্তিত্ব কি কখনও এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে মহানবী (সা.)-এর চরণে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন?

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এটি প্রমাণ করেছেন, মহানবী (সা.)-এর দাসত্ব ও তরবীয়তের কল্যাণেই হযরত উমর (রা.)'র মাঝে এই ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এমন খোদা-ভীতি ছিল।

হযরত উমর (রা.)'র আহলে বায়তের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কেমন ছিল এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত আয়েশা (রা.) দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। হযরত উমর (রা.)'র শাসনামলে যখন ইরান জয় হয় তখন সেখান থেকে আটা ভাঙ্গার উইন্ডমিল চালিত চাক্কি বা যাঁতা আনা হয় যা দিয়ে মিহি আটা ভাঙ্গানো আরম্ভ হয়। এই চাক্কি বা যাঁতা প্রথম যখন মদীনায় স্থাপিত হয় তখন হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দিয়ে বলেন, এর দ্বারা ভাঙ্গানো প্রথম মিহি আটা যেন হযরত আয়েশা (রা.)'র বরাবরে উপঢৌকনস্বরূপ পাঠানো হয়। অতঃপর তাঁর নির্দেশ মোতাবেক সেই মিহি ময়দা/আটা হযরত আয়েশা (রা.)'র খিদমতে পাঠানো হয় এবং তাঁর সেবিকা এই আটা দিয়ে পাতলা পাতলা ফুলকা প্রস্তুত করে। মদীনার নারীরা যারা এর আগে এমন আটা দেখে নি তারা দল বেঁধে হযরত আয়েশা (রা.)'র বাড়িতে ভীড় করে যে, চল এই আটা

কেমন আর এর রুটি কেমন হয় তা আমরা দেখি। পুরো আঙ্গিনা মহিলায় ভরে যায় আর সবাই এই আটা দিয়ে তৈরিকৃত রুটি দেখার প্রতীক্ষায় ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহিলাদের সম্বোধন করে এসব কথা বলছিলেন। মহিলাদের সম্বোধন করে বলছেন যে, তোমরা হয়তো মনে করবে সেটা অতি উন্নত মানের কোন আটা কিন্তু তা মোটেও তেমন কোন আটা ছিল না বরং বর্তমান যুগে তোমরা যে আটা প্রতিদিন খাও তার চেয়েও নিম্নমানের আটা ছিল বরং তোমাদের হতদরিদ্ররা আজ যে আটা খায় তার চেয়েও নিম্নমানের আটা ছিল। কিন্তু মদীনায় যে ধরনের আটা পাওয়া যেত তার চেয়ে সেই আটা উন্নতমানের ছিল। যাহোক, আটার রুটি প্রস্তুত হয় আর মহিলারা তা দেখে হতবাক হয়ে যায়। তারা অতিআগ্রহে তাদের আঙ্গুল সেসব ফুলকায় লাগাতো আর অবলীলায় বলতো, আহা কী নরম রুটি! এরচেয়েও ভালো আটা কি পৃথিবীতে হতে পারে?

রুটি তো প্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু এ পর্যায়ে মহানবী (সা.)-এর জন্য হযরত আয়েশা (রা.)'র ভালোবাসার কাহিনীর সূত্রপাত হয় আর মহানবীর (সা.)-এর জন্য তাঁর আবেগ অনুভূতি ও ভালোবাসা কত গভীর ছিল তা দেখুন! হযরত আয়েশা (রা.) সেই রুটির একটি ছোট্ট টুকরো ছিড়ে মুখে দেন। আর নারীরা যারা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারা সবাই সাগ্রহে হযরত আয়েশা (রা.)'র মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল যে, হযরত আয়েশা (রা.) হয়তো এই নরম ফুলকা খেয়ে খুব আনন্দিত হবেন, এটি খেয়ে হয়ত তিনি উপভোগ করবেন এবং তিনি আনন্দ প্রকাশ করবেন এবং বিশেষ ধরণের স্বাদ পাবেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রা.)'র মুখে সেই গ্রাস যেতেই মনে হয় যেন কেউ তার গলা চেপে ধরেছে, সেই গ্রাস তাঁর মুখেই থেকে যায় আর তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। মহিলারা বলে, হে উম্মুল মু'মিনীন আটা তো উন্নতমানের, রুটি অত্যন্ত নরম ও এর তুলনা হয় না, আপনার কি হয়েছে যে রুটি আপনি গিলতেই পারেন নি আর কাঁদতে আরম্ভ করেছেন? এই আটাতে কোন সমস্যা আছে কী? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আটায় কোন সমস্যা নেই, আমি জানি এটি খুব নরম তুলতুলে ফুলকা আর এমন জিনিস যা পূর্বে আমরা কখনও দেখিনি কিন্তু আমার চোখ থেকে অশ্রু এজন্য ঝরেনি যে, আটায় কোন ত্রুটি বা সমস্যা আছে বরং আমার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে যখন মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলো অতিবাহিত করছিলেন আর তিনি এত দুর্বল হয়ে পরেছিলেন যে, শক্ত খাবার খেতে পারতেন না কিন্তু সেদিন গুলোতেও আমরা পাথর দিয়ে পিষে আটা প্রস্তুত করে রুটি বানিয়ে তাঁকে দিতাম। তারপর তিনি বলেন, যাঁর কল্যাণে আমরা এই নিয়ামত লাভ করেছি তিনি তো এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন কিন্তু আমরা– যাদের তাঁর কল্যাণে এসব সম্মান লাভ হচ্ছে, আমরা এসব নিয়ামত ভোগ করছি, এই বলে তিনি সেই গ্রাস মুখ থেকে ফেলে দেন আর বলেন, এসব ফুলকা আমার সামনে থেকে নিয়ে যাও; মহানবীর যুগের কথা মনে হলে আমার গলা বন্ধ হয়ে যায় আর আমি এসব রুটি খেতে পারবো না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা কিসরার রাজধানী মিদিয়ান জয় করেন, তিনি (রা.) মসজিদে চামড়ার চাঁটাই বিছানোর নির্দেশ দেন এবং তাঁর নির্দেশে মালে গণীমত সেই চাটাইয়ের ওপর ঢেলে দেয়া হয়। মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা একত্রিত হন এবং সর্বপ্রথম যিনি মালে গণীমত নিতে যান তিনি ছিলেন, হযরত হাসান বিন আলী (রা.)। তিনি বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা যে সম্পদ মুসলমানদের দিয়েছেন তা থেকে আমার প্রাপ্য আমাকে প্রদান করুন। এতে হযরত উমর

(রা.) তাঁকে বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে নিন। তিনি তাঁকে এক হাজার দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর হযরত হাসান (রা.) চলে যান এবং হুসাইন বিন আলী (রা.) তাঁর সামনে আসেন এবং বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা যে সম্পদ মুসলমানদের দান করেছেন তা থেকে আমার প্রাপ্য আমাকে দিন, এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে গ্রহণ করুন এবং তাঁকে এক হাজার দিরহাম দেয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তাঁর পুত্র অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)'র পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) সামনে এগিয়ে আসেন আর বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে আমার অংশ আমাকে দিন। হযরত উমর (রা.) তাকে বলেন, সানন্দে এবং সসম্মানে নাও এবং তাকে পাঁচশ' দিরহাম দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি এক শক্তিশালী সুপুরুষ, আমি মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করতাম আর হাসান-হুসাইন তখন বালক ছিলেন, তাঁরা মদীনার অলি গলিতে ঘুরাফেরা করতেন। আপনি তাদের দু'জনকে এক হাজার দিরহাম করে দিয়েছেন আর আমাকে দিলেন পাঁচশ' দিরহাম। তিনি বলেন হ্যাঁ, যাও আমার কাছে এমন পিতা নিয়ে আস যেমনটি তাঁদের উভয়ের পিতা আর তাঁদের মায়ের মত মা নিয়ে আস আর তাঁদের নানার মত নানা, তাঁদের নানীর মত নানী, তাঁদের চাচার মত চাচা, তাঁদের মামার মত মামা, তাঁদের খালার মত খালা নিয়ে আস। আর তুমি নিশ্চয়ই এমনটি করতে পারবে না।

আবু জাফর কর্তৃক বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা.)'র অভিমত অন্য সবার অভিমতের চেয়ে উত্তম ছিল। তিনি যখন সবার ভাতা নির্ধারণ করার ইচ্ছা করেন লোকেরা নিবেদন করে, আপনি নিজের মাধ্যমে আরম্ভ করুন। তিনি বলেন, না, বরং তিনি মহানবী (সা.)-এর নিকটতম আত্মীয়ের মাধ্যমে আরম্ভ করেন। তিনি (রা.) সর্বপ্রথম হযরত আব্বাস (রা.) এবং এরপর হযরত আলী (রা.)'র অংশ নির্ধারণ করেন।

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)-কে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন; তাঁদেরকে বাহনে বসাতেন, তাঁদের উভয়কে সেভাবে বিভিন্ন জিনিষ দিতেন যেভাবে তাঁদের পিতাকে দিতেন। একবার ইয়েমেন থেকে কিছু কাপড় আসে। তিনি তা সাহাবীদের পুত্রদের মাঝে বন্টন করে দেন। কিন্তু তাঁদের উভয়কে তা থেকে কিছুই দেন নি। আর বলেন, এসব কাপড়ে এদের জন্য উপযুক্ত কোন জিনিস নেই। অতঃপর তিনি (রা.) ইয়েমেনের কর্মকর্তাকে বার্তা পাঠান আর তিনি তাদের উভয়ের মর্যাদানুযায়ী জামা বানিয়ে পাঠান। এই স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

এখন কতক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। নামাযের পর তাদের জানাযার নামাযও পড়াবো। তাদের মধ্যে প্রথম স্মৃতিচারণ হল, সোহেলা মাহবুব সাহেবার। তিনি ফয়েয আহমদ সাহেব গুজরাটি দরবেশের সহধর্মিণী, যিনি নাযের বায়তুল মাল ছিলেন। সোহেলা সাহেবা নব্বই বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তিনি বিহারের এক শিক্ষিত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তার পিতা আহমদী ছিলেন না। কিন্তু তার মা নিজ পিতার বয়আতের পর স্বয়ং পড়াশোনা করে বয়আত করেন। তিন চার বছর পর্যন্ত তার স্বামীর অসহযোগিতা ও দুর্ব্যবহারের পরও অনেক কষ্ট সহ্য করে তিনি আহমদীয়াতের ওপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার স্বামী বয়আত না করলেও পরবর্তীতে বিরোধিতা পরিহার করেন। কন্যাদের বিয়েও আহমদী পরিবারে হয়েছে। এভাবে সোহেলা সাহেবার বিয়েও আহমদী পরিবারে হয়েছে।

১৯৫৮ সালে মরহুমার মা প্রথমবার তার মেয়ে সোহেলা মাহবুব সাহেবার সাথে কাদিয়ান আসেন। সোহেলা মাহবুব সাহেবা বলেন, কাদিয়ানের জন্য তার হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা জন্মে। অনেক দোয়া করেন যেন কোনভাবে তিনি কাদিয়ানেই বসবাসের সুযোগ পান। যাহোক, তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সে সময় নাযের খিদমত দরবেশান ছিলেন। তিনি জীবন উৎসর্গ করে যে পত্র লিখেছেন তার উত্তরে তিনি লিখেন, আমি আপনার জীবন উৎসর্গ করা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আপনার এই পদক্ষেপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াক্ফ হিসেবে আপনার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হল, ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা, নিজ কর্মকে ইসলাম ও আহমদীয়াত সম্মত করা; যেন উত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৬৪ সালে জীবন উৎসর্গ করেন। ১৯৬৪ সালে চৌধুরী আব্দুল্লাহ্ সাহেব দরবেশের সাথে মরহুমার বিবাহ হয়। তার ঔরসে এক কন্যা সন্তান হয়। কিন্তু কিছুদিন পর তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। অতঃপর তার দ্বিতীয় বিবাহ গুজরাটি দরবেশ চৌধুরী ফয়েয আহমদ সাহেবের সাথে হয়। এ ঘরে এক পুত্র সন্তান হয় কিন্তু সে শৈশবেই মৃত্যুবরণ করে। মরহুমা অবসর পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছর কাদিয়ানের নুসরত গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হল, মুরুব্বী সিলসিলাহ্ রাজা খুরশীদ আহমদ মুনীর সাহেবের। যিনি অস্ট্রেলিয়ায় মুরব্বী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেখানে তার মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল পাকিস্তান ও আযাদ কাশ্মীরের বিভিন্ন অঞ্চলে মুরুব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি জামা'তের একজন অকুতোভয় মুরব্বী ছিলেন। আযাদ কাশ্মীরে দায়িত্ব পালনের সময় তাকে ভীষণ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ৭৪ সনের গোলযোগপূর্ণ যুগে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে (তিনি) বিরোধিতার মোকাবিলা করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এক মিটিং এ তার সম্পর্কে বলেন, সেখানে আমাদের একজন সাহসী মুরব্বী রয়েছেন। তাকে **'সাহসী মুরব্বী'** উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা খুরশীদ আহমদ সাহেব রাওয়ালপিণ্ডিতে তার একটি বাড়িও উপহারস্বরূপ জামা'তকে প্রদান করেছেন। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তার উপহার গ্রহণ করেন। রাজা সাহেব পাক ভারত বিভক্তির পর আহমদনগর চলে যান যেখানে জামেয়া আহমদীয়া গড়ে তোলা হয়েছিল। তিনি সেখানে পড়াশোনা করেন। ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি এক কামরায় একটি ছোট্ট দোকান খুলেন। ১৯৪৮ সনে তিনি ফুরকান ব্যাটালিয়ানেও যোগ দেন, ১৯৪৯ সনে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন এবং জামেয়ার প্রথম শাহেদ ব্যাচের পরীক্ষা পাশ করার পর মুরব্বী হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এবং কাশ্মীরে জামাতের সেবা করেন। ১৯৭৪ সনে তার বাড়িতে আক্রমণ হয় কিন্তু তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তা মোকাবিলা করেন। মানুষের ছোড়া পাথরের আঘাতে তিনি আহতও হন। যাহোক, বাড়ির সবাই নিরাপদ ছিল। তিনি সর্বদা দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে জোরালোভাবে তাগিদ দিয়ে বলতেন, ঐশী জামা'তের ওপর এ ধরণের পরীক্ষা এসেই থাকে আর এমন পরিস্থিতিতেও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে বিভিন্ন জামা'ত সফর করতেন এবং মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেন। এসব সফরের সময় যেসব স্থানে জামা'তের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের জন্য যেতেন সেখানে লোকেরা তাকে ধরে মেরেছে; বেশ কয়েকবার এমনটি হয়েছে কিন্তু কখনও তিনি কোন ধরণের অভিযোগ করেন নি। তার ৪ ছেলে এবং ৪ জন মেয়ে রয়েছে। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থান করছিলেন আর সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে যমীর আহমদ নাদীম সাহেবের। ৫৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়েছে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার প্রপিতামহ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত রহীম বখশ্ সাহেবের মাধ্যমে ১৮৯৭ সনে তাদের পরিবারে আহমদীয়াতের চারা রোপিত হয়। তার প্রপিতামহ যখন শোনেন যে, ইমাম মাহ্দী (আ.) এসে গেছেন তখন তার গ্রাম গুরুদাসপুরস্থ শিকারপুর মাছিয়া থেকে তিনি জলসায় অংশগ্রহণের জন্য কাদিয়ান যান এবং বয়আত করেন। এরপর তিনি তার এক আত্মীয় মেহের দ্বীন সাহেবকে অবগত করেন, তিনিও (কাদিয়ান) যান আর বয়আত করেন। এরপর তাদের তবলীগে গ্রামের প্রায় সবাই আহমদী হয়ে যায়। তিনি, অর্থাৎ যমীর আহমদ সাহেব জামেয়া পাশ করার পর এসলাহ্ ও এরশাদ মোকামীর অধীনে কিছুকাল পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে কাজ করেন আর এরপর মনসুবা বন্দি কমিটি তথা প্ল্যানিং কমিটির অফিসে তার নিযুক্তি হয়। এরপর কেন্দ্রীয় নাযারাতে এসলাহ্ ও এরশাদের অধীনে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০০৫ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি নাযের ওসীয়্যত অভ্যর্থনার সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে একজন পুত্র ও একজন কন্যা দান করেছেন। তার পুত্রও জামাতের মুরব্বী। তিনি মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে বেশ পটু ছিলেন। খুব ভালো বাস্কেট বল খেলোয়ার ছিলেন। এজন্যেও মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠতো। এসব সম্পর্ককে পরে জামা'তের কাজেও লাগাতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার অনেক বেশি ভরসা ছিল। বিপদের সময় দু'রাকাত নফল নামায পড়া এবং যুগ খলীফাকে পত্র লিখা তার চিরায়ত অভ্যাস ছিল। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তার দোয়া এবং তার নফল নামায আল্লাহ্ কবুলও করতেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, তাঞ্জানিয়ার জনাব ঈসা মোকি তালীমা সাহেবের। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি খ্রিষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ১৯ বছর বয়সে ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনার প্রতি তার আগ্রহ জন্মে এবং ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এর কয়েক বছর পর জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে অবগত হন আর গবেষণার পর ১৯৯২ সনে বয়আত করে আহমদীয়া জামাতর্ভুক্ত হন। বয়আতের পর মরহুমের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়, যা তার নিকটাত্মীয়রাও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। আর এই পবিত্র পরিবর্তন লক্ষ্য করে তার স্ত্রীও বয়আত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর মরহুম নিজের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কাজে ব্যস্ত থাকা অবস্থায়ও তিনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের তবলীগ করার সুযোগ হাতছাড়া হতে দিতেন না। চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে ছিলেন সর্বদা অগ্রগামী। বেশ কয়েকবার তিনি বলেছেন, খোদার পথে খরচ করার ফলে ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থসম্পদে বরকত সৃষ্টি হয়। তার ব্যবসা ছিল। তিনি অত্যন্ত মিশুক, সচ্চরিত্রবান ও বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। ওয়াক্ফে যিন্দেগী, জামা'তের কর্মকর্তাবৃন্দ ও কর্মীদের সাথে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তার উত্তরসূরিদের মধ্যে দু'জন স্ত্রী এবং ১০জন সন্তান রয়েছেন। তাঞ্জানিয়ার আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন, মরহুমকে দারুস্ সালামের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করা হয়েছিল। তার প্রকৃতিতে সরলতা স্পষ্টলক্ষিত হতো আর এজন্য তিনি মানুষের মনে স্থান করে নিতেন। তিনি প্রবীণ একজন নীরব কর্মী ছিলেন। এরপর তিনি তাঞ্জানিয়ার নায়েব আমীর নিযুক্ত হন এবং সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্য একজন উপদেষ্টা ছিলেন আর সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার

সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। আহমদীদেরকে তিনি সর্বদা পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং আহমদীয়া খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ব্যাপারে জোর দিতেন। জামা'তের কর্মীদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের প্রতিও খেয়াল রাখতেন। যথাসাধ্য সহযোগিতার চেষ্টা করতেন বরং সকালে অফিসে যাওয়ার সময় কর্মীদেরও নিজের গাড়িতে করে নিয়ে আসতেন যেন বাসে আসতে গিয়ে তাদের (অযথা) সময় নষ্ট না হয়। নিজ বাড়িতে একটি কক্ষ বানিয়েছিলেন নামায সেন্টার হিসেবে, যেখানে নামায পড়া হত। মূসীদের হিস্যায়ে জায়েদাদ প্রদানের ব্যাপারে যখন আহ্বান করা হয় তখন সবার আগে তিনি তার মূল্যবান দু'টি সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করান এবং হিস্যায়ে জায়দাদ পরিশোধ করে দেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার জনাব শেখ মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের; যিনি ভারতের কেরাং বাটেশা নিবাসী শেখ ইসরার আহমদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৩৩ বছর, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুম জন্মগত আহমদী ছিলেন। পুরোনো আহমদী পরিবারের সন্তান। অত্যন্ত সচ্চরিত্রবান, ধর্মসেবায় সদাতৎপর, জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সেবক। শৈশব থেকেই মসজিদের সাথে এক বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মরহুম ৮ বছর ধরে কাদিয়ানের নিযামত তা'মীরাতের সুপারভাইজার হিসেবে সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন আর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কাজ করতেন এবং অত্যন্ত গভীরভাবে কাজের পর্যবেক্ষণ করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও পিতামাতা, দুই ভাই এবং এক বোন রয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব সাইফ আলী শাহেদ সাহেবের, তিনি সিডনীতে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি একজন মূসী ছিলেন। তার নানার দিক থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেব এবং চৌধুরী গামে খান সাহেব; তিনি যথাক্রমে তাদের দৌহিত্র ও প্রদৌহিত্র ছিলেন। তার ভাই হায়দার আলী যাফর সাহেব বর্তমানে জার্মানিতে মুবাল্লিগ সিলসিলাহ্ এবং নায়েব আমীর হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, ১৯৬১ সালে মাধ্যমিক পাশ করে তিনি হায়দ্রাবাদে চাকরি আরম্ভ করেন। এরপর আমাদের দুই ভাইয়ের পড়াশোনার খরচসহ, যাবতীয় ভরণপোষণ তিনিই নির্বাহ করেন এবং পিতামাতারও নিঃস্বার্থ সেবা করেন। অত্যন্ত মিশুক, কোমল স্বভাবী ও বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি শিশুদের সাথে স্নেহপূর্ণ এবং যুবকদের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনা ও খিলাফতের প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা ও আনুগত্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। নিজ সন্তানদেরকেও সর্বদা তিনি খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের শিক্ষা দিতেন। তিনি কর্মকর্তাদের অনেক সম্মান করতেন। কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের কথা বলা তিনি সহ্য করতেন না। অনেক দোয়া করতে অভ্যস্ত একজন মানুষ ছিলেন। তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং সুন্দর করে নামায পড়তেন। পাকিস্তানে থাকাকালীন তিনি সেক্রেটারী মাল এবং সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে মিরপুর খাস জামা'তের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন এবং এমারত প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত তিনি সেখানকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডাঃ আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাহাদতের পর তিনি স্থানীয় আমীর এবং জেলা আমীর হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মিরপুর খাস-এর জেলা আমীর ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন

অঙ্গসংগঠনেও তিনি অনেক সেবা প্রদানের সুযোগ লাভ করেছেন। একইভাবে তিনি অস্ট্রেলিয়াতে কাযা বোর্ড, অস্ট্রেলিয়ার সদস্য ছিলেন, আনসারুল্লাহ্‌র নায়েব সদর আউয়াল ছিলেন। অনুরূপভাবে ২০১৬ সাল থেকে তিনি সেখানকার জামা'তের রিশতানাতা সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশাতেই দুই পুত্রকে হারান এবং অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সেই শোক সহ্য করেন। সর্বোপরি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিনি চারজন পুত্র রেখে গেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে রশীদ আহমদ হায়াত সাহেবের পুত্র জনাব মাসঊদ আহমদ হায়াত সাহেবের, যিনি ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তার বংশে তার দাদা হযরত বাবু উমর হায়াত (রা.)'র মাধ্যমে আহমদীয়াত আসে, যিনি চৌধুরী পীর বখ্‌শ সাহেবের পুত্র ছিলেন। হযরত উমর হায়াত (রা.) ১৮৯৮ সালে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। প্রথমে সেনাবাহিনীতে চাকরি করেন, এরপর কেনিয়া চলে যান। মাসঊদ হায়াত সাহেব ১৯৬৭ সালে কেনিয়া থেকে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নিয়মিত নামায ও রোযায় অভ্যস্ত, সদাচারী, মিশুক, অতিথি-বৎসল এবং স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। দু'বার হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সাথে বিভিন্ন দেশ সফরকালে ড্রাইভিং এবং নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৩ সালে যখন ওয়ালথামস্টো (Walthamstow)-তে বায়তুল আহাদ মসজিদ ক্রয় করা হয় তখন সেখানে তিনি এবং তার স্ত্রী তাহেরা হায়াত সাহেবা সর্বাধিক আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক দিক দিয়ে তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন এবং সেই সম্পদের বহুলাংশ তিনি আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়ও করতেন। ইষ্ট লন্ডনের রেড ব্রীজ যখন পৃথক জামা'ত হয়ে যায় তখন তাদের কোন মসজিদ ছিল না। তিনি এটি জানতে পেরে তার বাড়ির একটি অংশ জামা'তের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন, যেখানে তিন বছর পর্যন্ত জামা'তের সেন্টার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানে জামা'তের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। তার দু'জন পুত্র রয়েছে। দ্বিতীয় স্ত্রী বর্তমান আছেন, কেননা তার প্রথম স্ত্রী মারা গেছেন আর দুই পুত্র রয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লা এসব প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও আহমদীয়াতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন। আর এসব বুযূর্গের দোয়া তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের (গায়েবানা) জানাযার নামায পড়াব।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)